কালীপুজা-চিত্রাবলী

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

ও

শ্রীবিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী

প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৩৮

কালীপূজা-চিত্রাবলী

কালীপুজা-চিত্রাবলী

(১)

শিশু-মানুষ জন্ম নিয়েই ভীষণ ভয় পেয়ে গেল আপনার চারিদিক্ লক্ষ্য ক'রে। এ ভয়—মৃত্যুভয়। ভয়ের সঙ্গে এমনই ক'রে কত দিন যে কেটে গেল তার ঠিক নেই।

(১)

(২)

একদিন এই ভয়ই তাকে বরাভয় দিলে। ঋষির মূর্তি ধ'রে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললে, "ভয় কি? এই দেখ জীবন। এতদিন জীবন দেখতে পাও নি ব'লেই ভয় পেয়েছ। চোখ ফোটে নি তোমার।" ভীত বিহ্বল মানুষ বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চাইলে। ঋষির স্মিত হাস্যে সে স্থির হ'ল। ধীর হয়ে তাঁর পায়ের তলায় বসল। ঋষি বলতে লাগলেন—ছবি এঁকে এঁকে, গান গেয়ে গেয়ে, কথা ক'য়ে ক'য়ে—মানুষের অন্ধতার কথা। আকাশের দিকে চেয়ে মানুষকে বললেন, "দেখ।" গাছের দিকে চেয়ে মানুষকে বললেন, "দেখ, শোন তার মর্মর আত্মপ্রকাশ।" মাটির দিকে চেয়ে বললেন, "অনুভব কর বসুন্ধরার প্রসববেদনা, তার মায়ের বুকের ব্যথা। তোমার চোখ খুলে যাবে, আনন্দ পাবে, ভয় দূর হবে, মৃত্যু পালিয়ে যাবে, তুমি অমর হবে। পৃথিবীর সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, বিচ্ছেদ-কলহ, সব কিছু দেখেও তুমি আর বিক্ষিপ্ত হবে না, ভীত হবে না। তুমি আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে আত্মস্বরূপকে অনুভব করবে, নিজেকে বলতে পারবে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'।" ছবি এঁকে এঁকে ঋষি দেখাতে লাগলেন,—মানুষের ছবি, মানুষের কাজের ছবি, তার ভাবনার ছবি, মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার ভিতরেও যে একটা আত্মানুসন্ধান চলেছে তারই ছবি, মানুষের ভগবান্ হয়ে ওঠার ছবি।

(২)

(৩)

ঋষি বললেন, "দেখ, তোমরা কেমন অন্ধ! যদি তোমরা তিন জন থাক তো একটা জিনিসকে তিন রকম দেখবে। দুটো বড় গাছ, তার পাশে একটা ছোট গাছ মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে ছায়া ফেলে। একজন দেখছ, পাখী তার বাচ্চাকে খাবার দিচ্ছে; আর একজন হয়তো দেখবে, গাছ আর গাছের ছায়া; অন্যজন দেখছ, বাপ-মা হেঁটে চলেছেন, আর মায়ের আঁচল ধ'রে চলেছে ছোট্ট শিশুটি। তোমাদের ঠিক চোখ ফোটে নি ব'লে একই জিনিসকে এই তিন রকম ভাবে দেখতে পার।"

(৩)

(৪)

ভয়-পাওয়া মানুষকে ঋষি আবার বললেন, "এই যে তুমি-আমি রক্তমাংসের শরীর নিয়ে কথা বলছি, কথা শুনছি, এও এক রকমের ভ্রম। জ্ঞান হ'লে, চোখ ফুটলে, আমাদের দু'জনেরই পিছনে রক্তমাংসের আড়ালে যে কঙ্কাল বা মরণ রয়েছে তা আমাদের নজরে পড়বে।"

(৪)

(৫)

"তারপর দেখ মানুষের অন্ধতার আর এক দৃশ্য।"—ব'লে ছবি দেখালেন—কেউ বা মাটি কুপিয়ে বীজ বুনে গাছ তৈরি করছে, কেউ বা সেই গাছ কেটে রস সংগ্রহ ক'রে খাদ্য তৈরি করছে, কেউ বা ঘরের দাওয়ায় ব'সে গাছের জন্ম, খাদ্যের ইতিহাস কিছুই না জেনে বেশ আরামে উদর পূরণ করছে।

(৫)

(৬)

ঋষি বললেন, "এ জীবনে সবাই আমরা অন্ধ, সবাই মৃত্যুর নিগড়ে বন্ধ—পশু, পাখী, মানুষ, সব কিছুই ; তবু এমনই অন্ধ মানুষ যে পরস্পর পরস্পরকে মারছি। নিজের হাত-পা-ও যে মৃত্যুর দড়িতে বাঁধা, তা না দেখে আত্মরক্ষার জন্য পশুহত্যা করছি।"

(৬)

(৭)

মানুষের অন্ধতার আর একটি উদাহরণ দিলেন ঋষি—ছবি আঁকলেন। আকাশের দিকে চেয়ে মানুষ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছে। পরের ধাপে পা না দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে এমন সময়ে আর একজন ব'লে উঠল, "কর কি! কর কি!" দ্বিতীয় লোকটির উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু সেও তার পশ্চাতে চেয়ে দেখলে না, কোথা থেকে একজন ষণ্ডামার্ক এসে তাকে কঠিন আঘাত করছে পিছন থেকে। বেচারী তৃতীয় ব্যক্তিও জানে না, হয়তো পরমুহূর্তেই সে মারা যেতে পারে।

(৭)

(৮)

এই যে অন্ধতা—একেই ঋষি বললেন, "মায়া।" তার পরই দেখালেন আর একখানি চিত্র। তাতে দেখতে পাচ্ছি, আমরা—ফোটা ফুলের সামনে কাণামাছির মত—পশু, পাখী, মানুষ, গাছপালা, চন্দ্র, সূর্য সব জীবন্ত জগৎই যেন মায়ায় বাঁধা চোখ নিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। পৃথিবীতে যা-কিছু দেখতে পাচ্ছি সব কিছু এই মায়ার ছেলে—মায়ের আঁচল ধ'রে কোথায় চলেছে কে জানে!

(৮)

(৯)

দক্ষরাজার মেয়ে মায়ার কৈলাসে শিবঠাকুরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। দক্ষরাজা মস্ত রাজা, সম্পদের তাঁর শেষ নেই। বেশি ঐশ্বর্য ছিল ব'লে অহঙ্কারও তাঁর কিছু বেশি ছিল। নারদের বুদ্ধিতে প'ড়ে শিবঠাকুরকে জামাই ক'রে তিনি বড়ই আপসোস করছিলেন। শিব সন্ন্যাসী লোক। বাঘছাল পরা, ছাই-মাখা গা, হাড়ের মালা গলায়, এক হাতে ত্রিশূল—এক হাতে ডমরু, জল পান করেন মড়ার মাথায়, শ্মশানে করেন বাস, আর ষাঁড়ে চ'ড়ে ত্রিভুবন ঘুরে বেড়ান। তাই ধনী দক্ষের ভিখারী শিবকে জামাই ক'রে মন ভাল ছিল না, শিবের প্রতি তাঁর একটা অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্যের ভাবই ছিল। দক্ষপ্রজাপতি যজ্ঞ করবেন, ত্রিলোকের দেবতারা নিমন্ত্রিত হলেন, শুধু বাদ পড়লেন শিব। কিন্তু মেয়েকে তো আর বাদ দেওয়া যায় না! তাই, শিব যখন ধ্যানস্থ আছেন মেয়েকে নিমন্ত্রণ করতে দক্ষপ্রজাপতি এলেন কৈলাসে। বেলতলায় শিব ব'সে আছেন—ধ্যানে মগ্ন,—কে এল, কে গেল, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই, পাশে ষাঁড় ব'সে আছে। আদর ক'রে মায়া বাপকে বসতে আসন পেতে দিলেন। দক্ষ বললেন, "আমি রাজা, শ্মশানে মশানে বসি না। শিবের ধ্যান ভাঙলে তার অনুমতি নিয়ে তুই আসিস যজ্ঞ দেখতে। যতই হোক, স্বামী—অনুমতি তো নিতে হবে!" মেয়ে বাপের পায়ের ধূলো নিলে দক্ষপ্রজাপতি বিদায় নিলেন।

(৯)

(১০)

পরের দিন সকালে মায়া যখন শিবের কাছে বাপের বাড়ি যাবার অনুমতি নিতে এলেন, শিব বললেন, "তোমার যাওয়া হবে না। ধ্যান ক'রে আমি জানতে পেরেছি দক্ষপ্রজাপতি যজ্ঞসভায় শিবনিন্দা করবেন। সতী তুমি, পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করবে, সুতরাং তোমার যাওয়া হবে না।" মায়ার আর এক নাম সতী। সতী বললেন, "হ্যাঁ।" শিব বললেন, "না।" সুরু হ'ল কলহ। সাময়িকভাবে ক্রোধে শিব অন্ধ হয়ে উঠলেন। জোর ক'রে ধমক দিয়ে মায়ার অসম্মান করলেন। পুরুষের অহঙ্কার দিয়ে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করলেন যে, তিনি বড়, মায়া ছোট।

(১০)

(১১)

তখন শিবশক্তি মায়া নিজের সতীরূপ, বধূরূপ, পরিত্যাগ ক'রে দশমহাবিদ্যা-রূপে শিবকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন ক'রে নানারূপ বিভীষিকা দেখালেন; শিব আপনার উত্তেজনায়, আপনার দুর্বলতায় অভিভূত হয়ে, অন্ধের ন্যায় জ্ঞানহারা হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। কালী—মায়ার দশমহাবিদ্যার একটি রূপ। এই বিভিন্ন রূপে মায়া শিবকে দেখিয়েছিলেন যে শিবের পক্ষেও মায়ার সঙ্গে বিরোধ ক'রে নিজের ধৈর্য রাখা সম্ভব নয়।

শিব হচ্ছেন ত্রিকালজ্ঞ—সব জানেন। তিনি জন্মমৃত্যু সুখদুঃখের অতীত, তাঁর ভয় নেই, ভাবনা নেই, তিনি সদানন্দময়। মায়া হলেন শিবের গৃহিণী। একমাত্র শিবের কাছেই কেবল তিনি পরাজিত হয়েছেন। মায়ার সব খবর কেবল শিবই জানেন। শিবই কেবল মায়াকে সম্পূর্ণ দেখতে পেয়েছেন। তাই তাঁর আর ভয় নেই। যা কিছু দেখা যায়, যারই রূপ আছে, তাইতেই মায়া রয়েছেন। তাই মায়াকে জানা মানে সব-কিছুকেই জানা। মন স্থির না হ'লে মায়াকে জানা যায় না। মন স্থির না হ'লে কিছুই ঠিকভাবে দেখা যায় না। শিবের মন স্থির হয়েছে তাই তিনি মায়াকে দেখতে পেয়েছেন। জগতে সব মানুষের মধ্যেই এই শিব আর মায়া—পুরুষ আর প্রকৃতি হয়ে চিরকাল খেলা করছেন। মানুষ যদি কখনও মন স্থির ক'রে এই শিব ও মায়াকে দেখতে পায় তো নিজেদের স্বরূপ দেখতে পাবে। অমনই সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ খুলে যাবে, ভয় ভেঙে যাবে, সে আনন্দ পাবে, ধীর বীর হয়ে উঠবে, জ্ঞানী পণ্ডিত হয়ে উঠবে। তাই ভয়-পাওয়া শিশুমানুষকে ঋষি উপদেশ দিলেন, "দেখ, চোখ মেল।" দেখালেন শিব ও মায়ার ছবি।

(১১)

(১২)

ভয়-পাওয়া মানুষকে শিব ও মায়ার এই ছবি দেখিয়েই ঋষি অন্তর্হিত হলেন। তখন সেই মানুষ অন্ধকারে গালে হাত দিয়ে ব'সে ভাবতে লাগল—ঋষির উপদেশের কথা, নিজের অন্ধতার কথা।

(১২)

(১৩)

সে মায়ার স্বরূপ জানবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। ঋষি বলেছেন, "জীবন দেখ।" মানুষ জীবনের পুঁথি সংগ্রহ ক'রে গভীর মনোনিবেশ-সহকারে নিভৃতে আসনে ব'সে সেই পুঁথির পাতা একের পর এক উলটে দেখতে লাগল। বন্ধু এসে ডাকে, টানাটানি করে বেড়াতে যাবার জন্য। সে বলে, "না ভাই, এখন আমি যাব না, আমার কাজ আছে। অনেক কিছু জানতে হবে। আমার মনে হচ্ছে, চোখ থাকতেও আমরা সকলে অন্ধ। এখন তুমি যাও। সাধনা ক'রে আমায় জ্ঞান লাভ করতে হবে, চোখ ফোটাতে হবে। আর বৃথা সময় নষ্ট করা চলবে না।" বন্ধু ফিরে গেল।

(১৩)

(১৪)

নিভৃতে ব'সে মানুষের আবার বই পড়া সুরু হ'ল। মানুষ পড়ে আর ভাবে,—কেমন ক'রে জীবনটাকে ভয়হীন, আনন্দময় ক'রে তোলা যায়! ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার ছেলেবেলার একখানা দল-বেঁধে-খেলা-করার ছবি মনে ভেসে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে তার মন ভ'রে গেল। সে দেখলে, মিলে-মিশে খেলা করার মধ্যে কারুর একলার স্বার্থ নেই, সকলেরই এক লক্ষ্য—আনন্দ পাওয়া। জীবন থেকে আনন্দ পাবার জন্য সবাই যে যার গুণ ও শক্তি নিয়ে যদি খেলার মত ক'রে খুশি হয়ে একই উদ্দেশ্যে কাজ ক'রে যায়, তা হ'লে আর গোল থাকে না।

(১৪)

(১৫)

সে আরও দেখলে, ঠিক এই মনোভাব নিয়েই পূর্বের জ্ঞানী, ঋষি ও প্রাচীনেরা তাঁদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যাতে আনন্দে দিন কাটাতে পারে, অন্ধতা নাশ ক'রে জীবনের আদর্শ—শিবত্ব ও সতীত্ব—অর্জন করতে পারে, তারই উপায় ক'রে গিয়েছিলেন এ দেশের জন্য এক অভিনব ও সুন্দর সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন ক'রে। তাঁদের ছেলেরা অর্থাৎ এ দেশের সভ্য মানুষের দল, খেলুড়ে ছেলের দলের মত যে যার গুণ ও প্রবৃত্তি অনুসারে কেউ হাল, কেউ বস্ত্র, কেউ লেখনী-পাতাড়ি, কেউ অস্ত্রশস্ত্র, কেউ বাণিজ্যের জাহাজ, কেউ ঔষধি, কেউ উপবীত ধারণ ক'রে মন্ত্র আবৃত্তি ক'রে, সুরু ক'রে দিলে জীবন নিয়ে খেলা। এই খেলার ফলে ফল ফলল, ফুল ফুটল, খাদ্য সংগৃহীত হ'ল, বস্ত্র নির্মিত হ'ল, ভাবের আদান-প্রদান হ'ল, হিংস্র পশুর হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় হ'ল, বাণিজ্য বিস্তৃত হ'ল, ব্যাধি প্রশমিত হ'ল, গৃহ নির্মিত হ'ল, মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল, এবং ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপাঠ ক'রে সুরু ক'রে দিলেন দেবতার পূজা।

(১৫)

(১৬)

আজকের অন্ধ মানুষ, ভয়-পাওয়া মানুষ, বোকা মানুষ, শিশুমানুষ, ঋষির উপদেশ শুনে অনেকটা শান্ত হ'ল। মানুষের ইতিহাসে জীবনের এই ভয়হীন আনন্দময় ছবি দেখে তার দেখার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল, এবং আর পাঁচটি মানুষ—তার আত্মীয়েরা সব কেমন আছে, কি করছে, কি ভাবছে, দেখতে এল শহরে। দেখলে আর এক রকমের ছবি। তারা জীবনের আনন্দ খুঁজছে, কিন্তু পাচ্ছে না। বেশির ভাগ লোকের অভাব। মানুষে মানুষে মিল নেই, সমাজ-ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা নেই। পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি ক'রে অত্যন্ত দুঃখে দিন কাটাচ্ছে। চারিধারে হট্টগোল, রেষারেষি, মারামারি। বেশির ভাগ আত্মীয়েরাই নিজেদের খুব বুদ্ধিমান্ মনে ক'রে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উপায় চিন্তা না ক'রে, ছলে বলে কৌশলে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ ক'রে আর সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করতেই ব্যস্ত। সে দেখলে, দরিদ্র মূর্খের দল এই ব্যবস্থাকেই জীবনের আদর্শ ক'রে, অর্থ ও আত্মসুখকেই পরিবেষ্টন ক'রে উল্লাসে নৃত্য করছে। স্বার্থপরতা ও বর্বরতাকে বলছে সভ্যতা।

(১৬)

(১৭)

জীবনের সুন্দর রূপ যে দেখেছে, কদর্যতা আর তার ভাল না লাগাই স্বাভাবিক ; তাই মনের দুঃখে ঋষির শিষ্য মানুষ যখন শহর ছেড়ে চ'লে আসছে তখন পথে আর এক দৃশ্য দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মনে একটু আশারও সঞ্চার হ'ল। সে দেখলে, একজন স্থূল ও জঠরসর্বস্ব, বিলাসী ও সৌখিন ব্যক্তি আর একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ভদ্রলোককে খুব গম্ভীরভাবে বিজ্ঞের মত উপদেশ দিচ্ছেন।

প্রথম ব্যক্তি—"কিহে, বাড়ির সব খবর ভাল তো ? এই বয়সে যে একবারে নুয়ে পড়েছ ?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি—"আর মশাই, অনেকগুলি ছেলেপুলে, তাদের অসুখ-বিসুখ, অর্থ-চিন্তা, তাদের শিক্ষা, মানুষ করার ভাবনা নিয়ে একেবারে জেরবার হয়ে গেলুম। আপনার মত উত্তরাধিকারসূত্রে ধনৈশ্বর্য তো পাই নি। এখন নিজে ভেঙে প'ড়েও যদি ছেলেগুলোকে মানুষ ক'রে মরতে পারি তো বাঁচি।"

(১৭)

(১৮)

মধ্যবিত্ত লোক চায় ধনী হ'তে। তাই ধনীকে সে বেশি খাতির করে ও তার কথা মন দিয়ে শোনে। ধনী বলছে, সেও খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছে।

ধনী—"দেখ তো কি অন্যায়! আমরা, পূর্বজন্মের সুকৃতিতেই বল আর বরাতেই বল, বড়লোকের ঘরে জন্মেছি, তাতে লোকের এত হিংসে কেন? আমাদের আছে, তাই আমরা আরাম করি, বিলাস করি।"

মধ্যবিত্ত—(অন্যমনস্কভাবে) "হ্যাঁ।"

ধনী—"দেখ, খুব সাবধান। ছেলেপুলেদের উপর নজর রেখ, যেন কুসঙ্গে প'ড়ে নষ্ট হয়ে না যায়। শাঘ'রেদের কাছ থেকে তাদের তফাতে রেখ। বড়লোককে খাতির দুষ্টলোকে আজকাল বড়-একটা করছে না। আরে বাবা, যে যার সে তার! তাদের নিজের গণ্ডা বুঝতে শেখা; তা নয়, সকলেই সমান। বলে, কেউ নিজের জন্য নয়—সকলে সকলের জন্য। আমরা, ধনী লোকেরা, দুমুঠো পেট ভ'রে খেতে পাই, একটু আরামে থাকতে পাই, পাঁচটা দরিদ্র লোকে সম্মান করে—এ আর ওদের সহ্য হচ্ছে না। বলে কিনা, অল্প খাও, সহজভাবে জীবন-যাপন কর, সুচিন্তা কর, কাজ কর। আরে ভায়া, সকলেই যদি কাজ করবে তো আরাম করবে কে?"

মধ্যবিত্ত বড় বড় চোখ ক'রে অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে, যেন কিছুই দেখছে না, কিছুই শুনছে না।

(১৮)

(১৯)

ধনী আবার বলে, "ভায়া দেখো, ওই দলে যেন ছেলেদের মিশতে দিও না।"

(১৯)

(২০)

"লাঠি কামড়ে এত ভাবছ কি? তোমার চাউনি দেখে আমারই যে ভয় করছে। তোমার ভালর জন্যই বলছিলুম, ভায়া। তুমি যে দেখছি, আমারই উপর রাগ করছ! হঠাৎ তোমার হ'ল কি?"

(২০)

(২১)

মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক হাতের লাঠি, গায়ের জামা দূরে ফেলে দিলেন। তার মুখের চেহারা, দাঁড়ানোর ভাব সব বদলে গেল ; তিনি বলতে লাগলেন। তাঁর ভাবের বদল দেখে ধনী অত্যন্ত ভীত হয়ে জোড়হাতে বিনীতভাবে শুনতে লাগলেন।

মধ্যবিত্ত—"কি ভাবছিলুম শোন। তোমাদের মত বিলাসী আর জঠরসর্বস্ব হ'লে আমাদের আর মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। গভীরভাবে চিন্তা ক'রে বাঁচবার উপায় আবিষ্কার করতে না পারলে, মানুষের সঙ্গে মানুষ হিংসাদ্বেষ ত্যাগ ক'রে সহজভাবে না মিলতে মিশতে পারলে, মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের আর মুক্তি নেই। আজ থেকে তোমার পথ আর আমার পথ নয়। তোমার জীবন সরল নয়। তোমার স্থূল অস্তিত্ব মিলনের অন্তরায়। তাই তা ত্যাগ করলুম।"

(২১)

(২২)

শহরের এই দৃশ্য দেখে ঋষির শিষ্য মানুষ এলেন গ্রাম দেখতে। দেখলেন একটি গাছের তলায় একটি পুরুষ গালে হাত দিয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন। কেমন ক'রে অন্নসংস্থান করবে তাই ভাবছে, আর পাশেই ইটের উনুন পেতে গাছ থেকে পড়া তাল কুড়িয়ে স্ত্রী রুটি গড়ছে। এমন ক'রে আর কতদিন চলবে! পেটের দায়ে তারা ভিক্ষাবৃত্তিই অবলম্বন করলে।

(২২)

(২৩)

কালীমন্দিরে প্রসাদ পাওয়া যায়, তাই তারা এ মন্দির ও মন্দির ক'রে ঘুরে বেড়ায়।

(২৩)
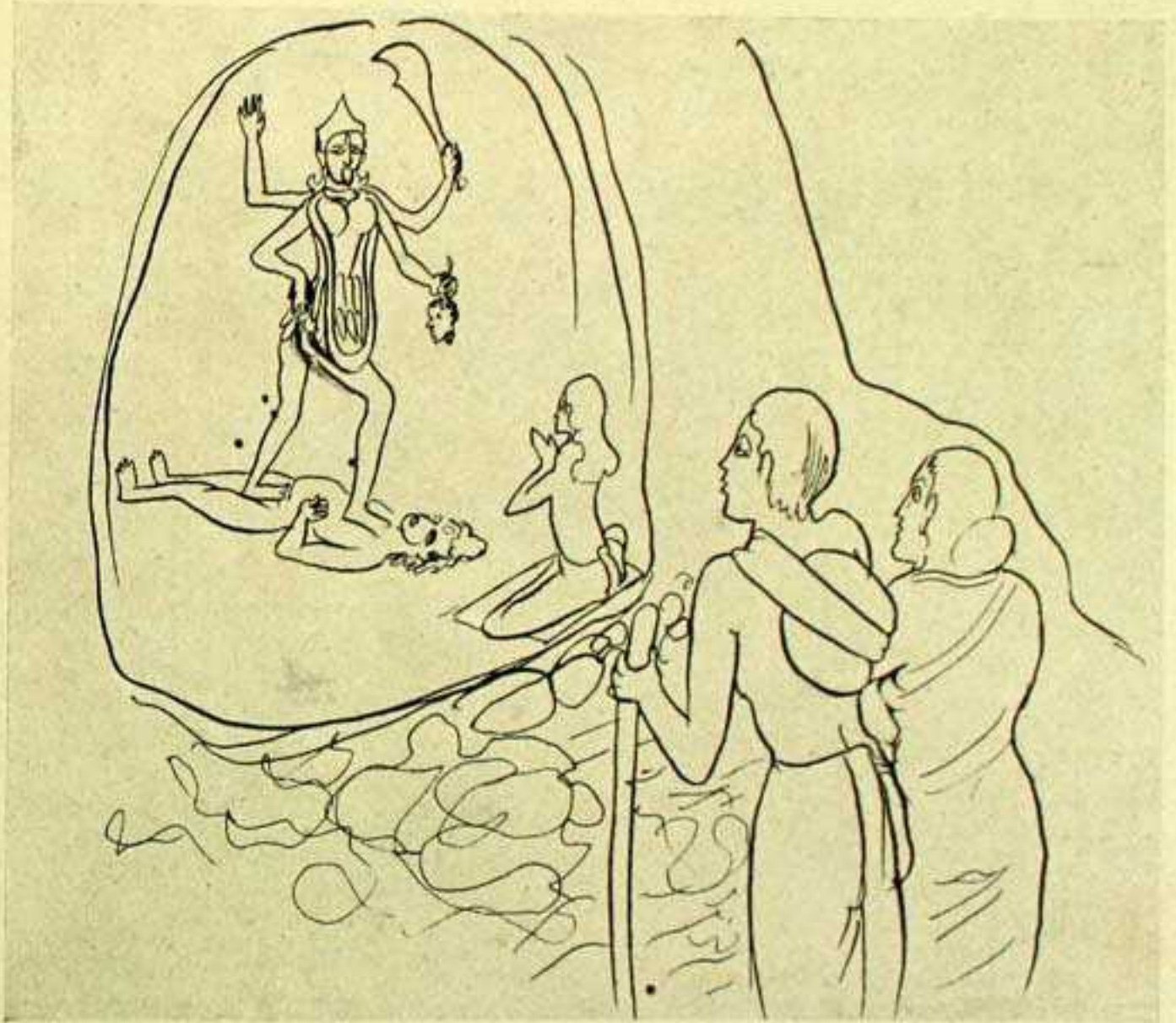
(২৪)

একদিন ভিক্ষার আশায় কালীমন্দির মনে ক'রে এক সন্ন্যাসীর গুহামন্দিরে তারা উপস্থিত হ'ল। ঋজু দীর্ঘ দেহ নিয়ে সন্ন্যাসী বেরিয়ে এলেন। নীচে নদীর ধারের জমির দিকে হাত বাড়িয়ে তাদের বললেন, "ভিক্ষা ক'রে কতদিন চলবে? ওইখানে গিয়ে মাটির দেবতার আরাধনা কর।"

(২৪)
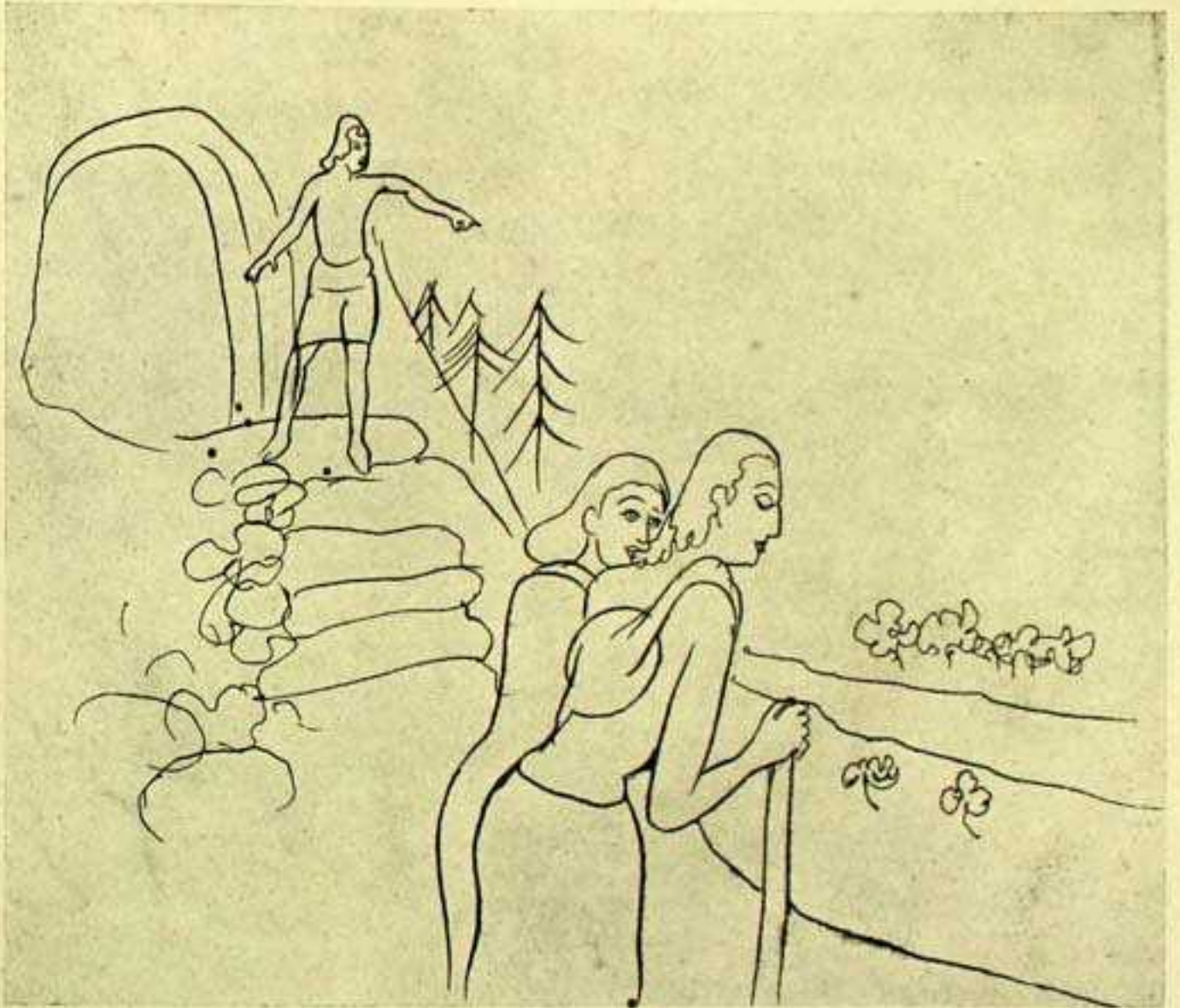
(২৫)

তারা ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নেমে গিয়ে ক্ষেত্রদেবতার আরাধনা ক'রে কৃষি-কর্মে দীক্ষিত হ'ল।

(২৫)

(২৬)

মাঠের মাঝে নদীর ধারে তারা ঘর বাঁধলে। পুরুষ বাইরে মাটি চ'ষে ফসল ফলায়, স্ত্রী করে ঘরের কাজ। জীবনে তাদের শ্রী ফিরে এল, অভাব দূর হ'ল।

(২৬)
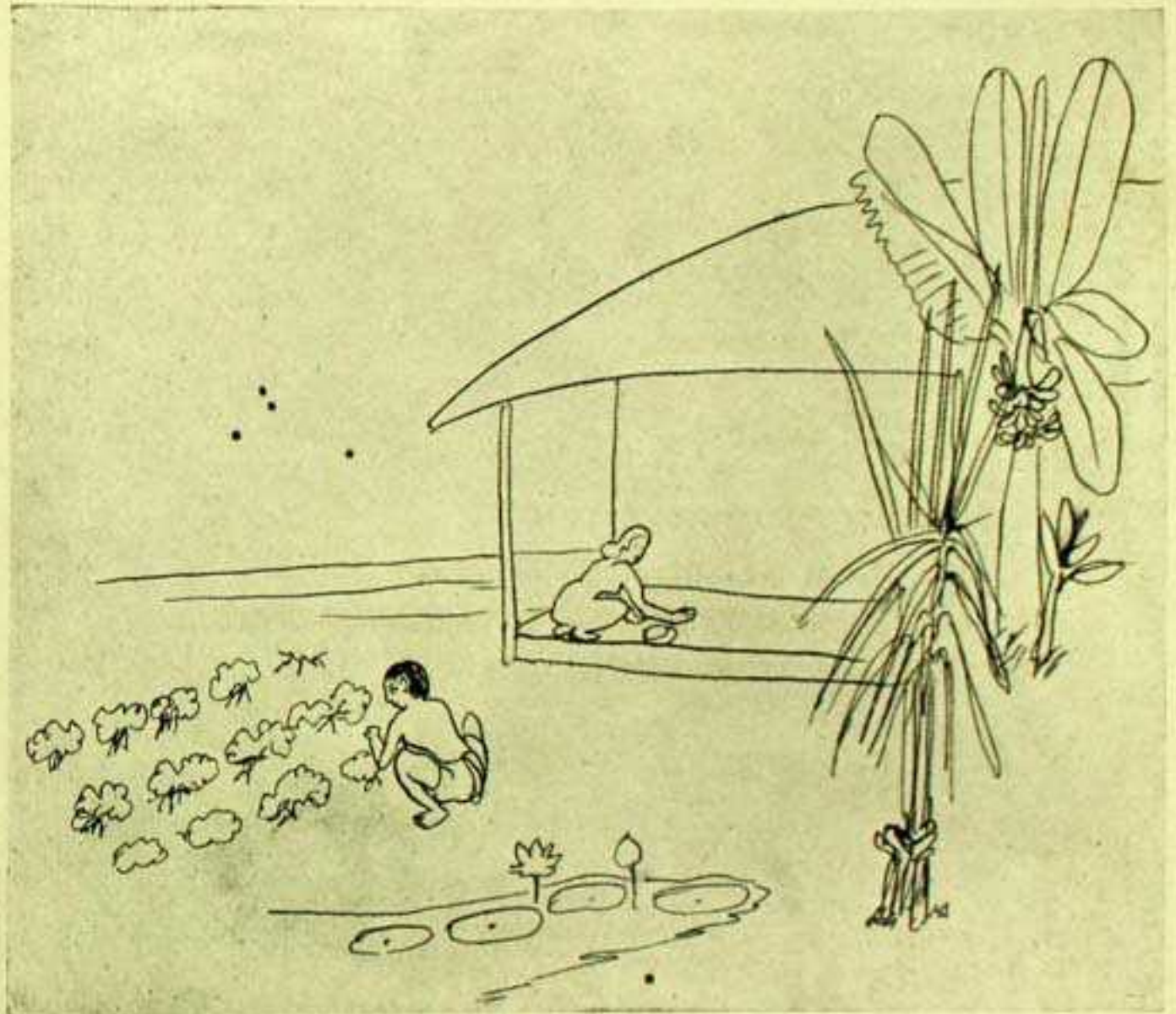
(২৭)

কিছুদিন বাদে তাদের ছেলেপুলে হ'ল।

বছরের যে সময় চাষ চলে না, মাঠের কাজ বন্ধ থাকে, তখন তারা বাপ মা ছেলে সবাই মিলে, চাষের তুলো থেকে চরকার সুতো দিয়ে তাঁত বুনে কাপড় তৈরি করে। কাজে কর্মে সুখে স্বচ্ছন্দে তাদের দিন কাটে।

(২৭)
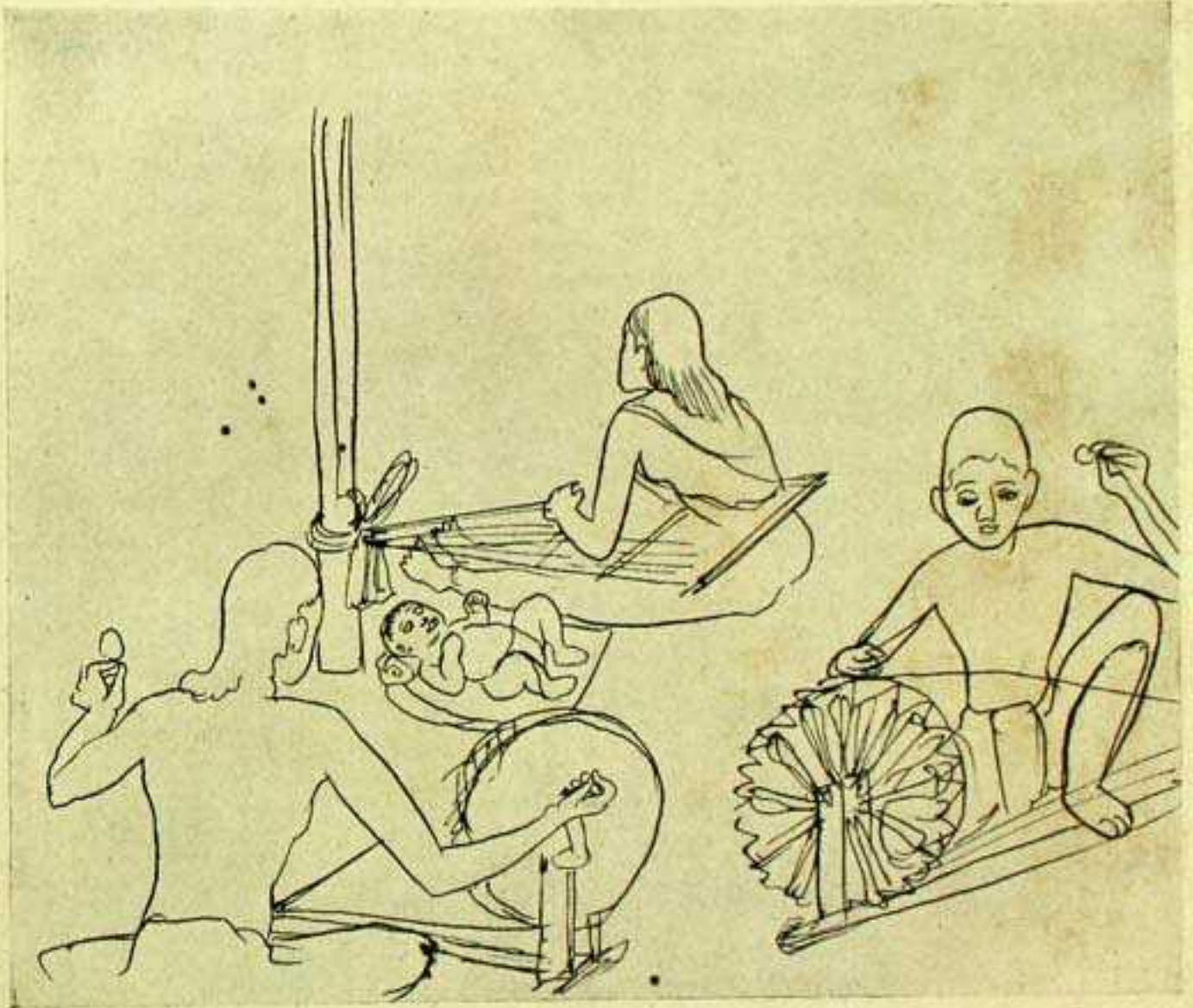
(২৮)

এমনই ক'রে যখন তাদের দেহের অভাব মিটল এবং উদ্বৃত্ত আহারও কিছু সঞ্চিত হ'ল তখন তারা মনের দিকে নজর দিলে। কেন না দেহ ও মন নিয়ে জীবন। মনকে স্থির করতে সুরু ক'রে দিলে পূজা-পাঠ। পিতা মাতার জীবন দেখে ছেলেরও শিক্ষা সুরু হ'ল।

(২৮)
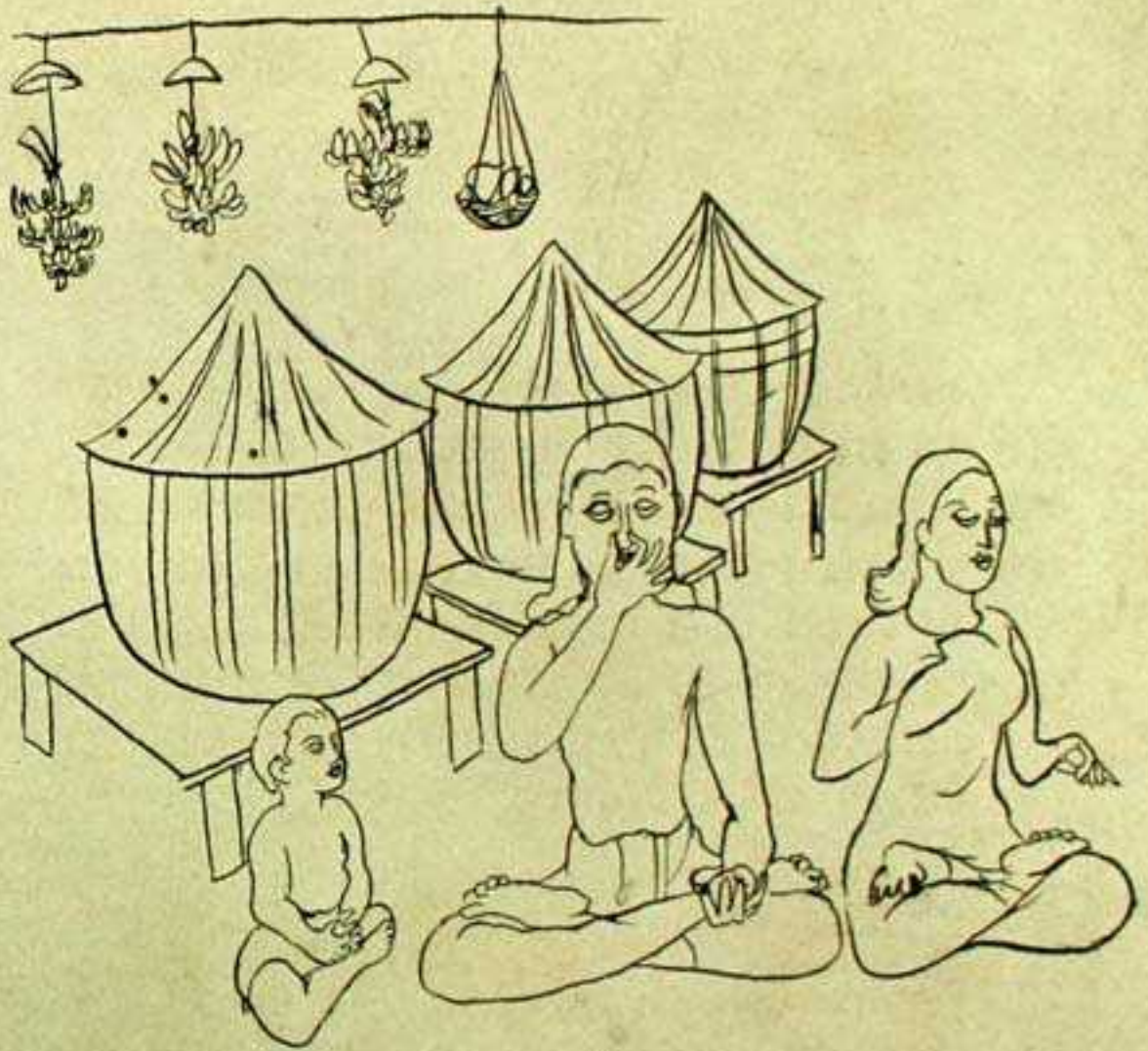
(২৯)

এতদিন অভাবের তাড়নায় মনে তাদের সুখ ছিল না, এখন আর সে অবস্থা নয়। এখন যেন তারা সংসারের আসনে চ'ড়ে অনেকটা নিশ্চিন্তভাবে সেই প্রাচীন অন্ধকার ও ভয়ের কাছ থেকে ছুটে চলেছে, বুকে অদম্য আশা নিয়ে, আনন্দ ও আলোকের সন্ধানে। এতদিনের দিশেহারা মানুষ যেন কোথায় যেতে হবে বুঝতে পেরেছে। এ সংসারের গণ্ডি যতদিন তাদের ছোট ছিল, মাঝে মাঝে সেই প্রাচীন ভয় তাদের মনে উঁকি মারত, মনে হ'ত, এই বুঝি তাদের আবার অবস্থা খারাপ হয়, কিছু অমঙ্গল ঘটে, এমনই কত কি! পা যেন তাদের সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগের সীমা রেখা দিয়ে বাঁধা।

(২৯)
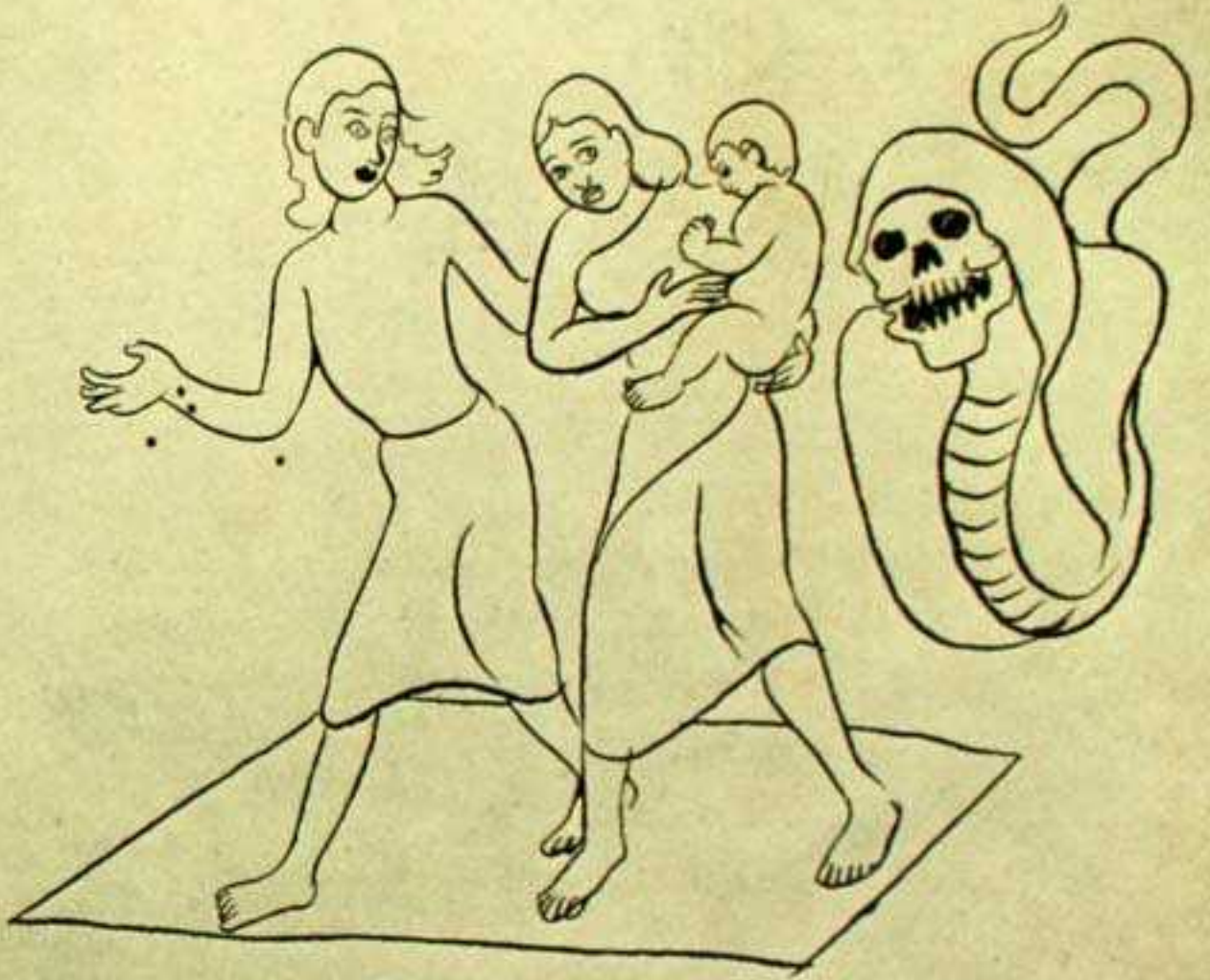
(৩০)

তারপর চলতে চলতে, দেখতে দেখতে, ভাবতে ভাবতে, হঠাৎ তারা দেখলে যে পায়ের তলায় সেই আসনের গণ্ডি আর নেই ; পিছনের ভয়কেও আর দেখা গেল না।

(৩০)

(৩১)

সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সত্য রূপ তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। দেখলে—জীবনটা যেন একটা কল। চিরকাল ধ'রে সবাই মিলে তারা তাদের সব কাজ, সব ইচ্ছাই যেন কাঁচা মশলার মত ঐ কলের এক মুখে ঢেলে দিচ্ছে, আর অমনই আর এক মুখ দিয়ে তাদের এই ইচ্ছা ও কাজের ফলস্বরূপ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শিবের বুকে কালীর মূর্তি ধ'রে বেরিয়ে আসছে।

(৩১)
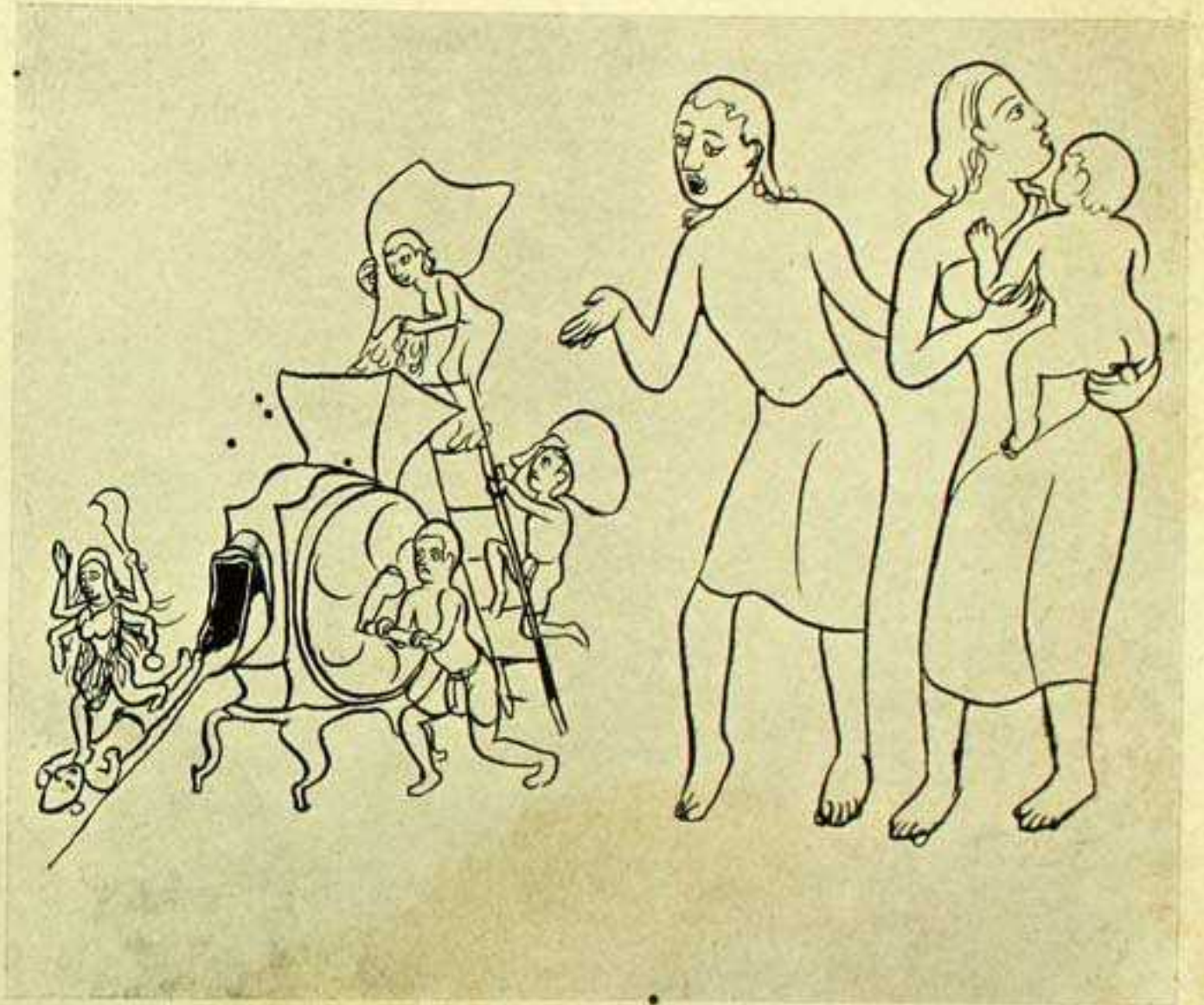
(৩২)

পুরুষ আর নারী তাদের জীবনের এই রূপ দেখলে। দেখলে, অসীম শিব অনন্ত জীবনের প্রবাহের মত স্থির হয়ে শুয়ে আছেন, আর বুকের উপর তাঁর ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, কালীর রূপ ধ'রে চিরকাল ধ'রে নেচে চলেছেন। গলায় মুণ্ডমালা প'রে মানুষকে বলছেন, জন্ম থাকলেই মরণও থাকবে। বাম হাতের খড়্গ দিয়ে তিনি অতীতকে ধ্বংস করছেন, ডান হাতের বর ও অভয় মুদ্রায় ভবিষ্যৎকে সৃজন করছেন, বর্তমানকে পালন করছেন। জীবনের এই মূর্তি যখন মানুষ ঠিক দেখতে পেলে তখন আর তার অভাব অভিযোগ, ভয় ভাবনা কিছুই রইল না। ভেদজ্ঞান ঘুচে গেল।

(৩২)

(৩৩)

ছেলের হাতে যেন অদ্ভুত এক আতসী কাঁচ দেওয়া হয়েছে, আর তার ভিতর দিয়ে জগতের বিভিন্ন বস্তু—পদ্মপাতা, বেঙ, মাছ, পদ্মফুল প্রভৃতি তাদের রূপভেদ সত্বেও একটি হাতের পাঁচটি আঙুলের মত বিবাদদ্বন্দ্বহীন ব'লে মনে হচ্ছে।

(৩৩)
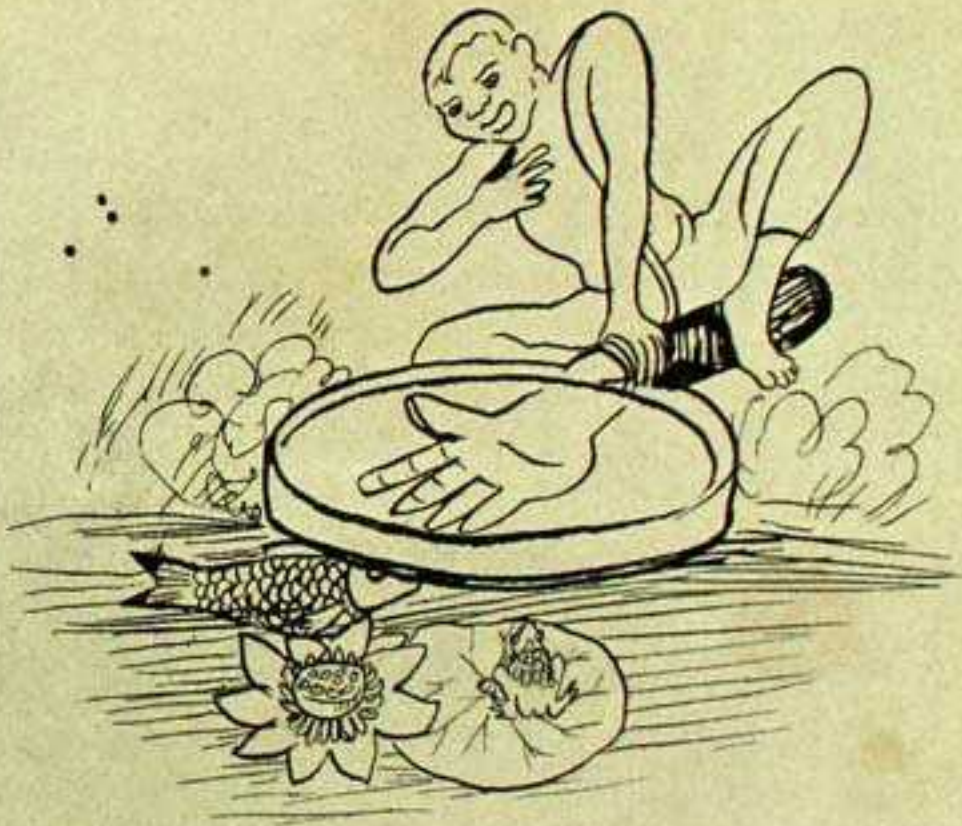
(৩৪)

এই ভাবে পুরুষ হয়ে উঠলেন শিব, এবং নারী হলেন গণেশজননী।

তোমরা সকলেই, অর্থাৎ সব ছেলেমেয়েরা কালক্রমে যাতে ভয়কে জয় ক'রে, নিজেদের চোখ ফুটিয়ে আনন্দ লাভ ক'রে শিব ও গণেশজননী হ'তে পার, তাই জীবনের আদর্শরূপ কালীমূর্তিকে মন্দিরে মন্দিরে স্থাপনা করা হয়েছে, তোমাদের দেখার জন্য, ভাবসাধনার জন্য, পূজার জন্য।

---

(৩৪)